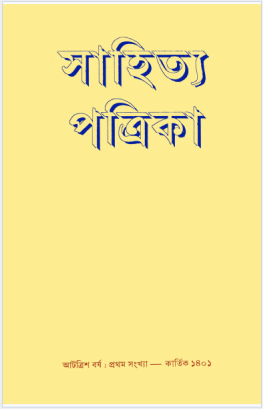

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সন্ধ্যা কাব্যে স্বদেশচেতনা

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু হেনা আবদুল আউয়াল
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.10
Pages	159-175
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

সন্ধ্যা কাব্যে স্বদেশচেতনা

আবু হেনা আবদুল আউয়াল

কাজী নজরুল ইসলাম শুধু রাজনীতি সচেতন ছিলেন না, রাজনীতির সঙ্গে যুক্তও ছিলেন। স্বদেশের পরাধীনতার বেদনায় তিনি আজীবন বিক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং স্বাধীনতার পক্ষে তার লেখনী চালনা করেছেন। *সন্ধ্যা* কাব্যেও তিনি স্বাধীনতার জন্যে তরুণদের ডাক দিয়েছেন এবং বন্দনা করেছেন দেশ-বিদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের। একটি শোষণমুক্ত, সাম্প্রদায়িক হানাহানিমুক্ত স্বধীন স্বদেশের জন্যে নজরুলের যে-আকাঙ্ক্ষা তারই আবেগঘন শৈল্পিক প্রকাশ *সন্ধ্যা*।।

এম. ফিল. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) শুধু রাজনীতি সচেতন কবিই ছিলেন না, রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কবিও ছিলেন। 'তিনি কেবল লেখনী পরিচালনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী ও সংগ্রামশীল রাজনীতি, সংগঠন ও সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন [রফিকুল ইসলাম ১৯৯১:২৫৭]। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের বঙ্গীয় ভূ-খণ্ডে তাঁর জন্ম ও বিকাশ। তাঁর সক্রিয় জীবনকাল (১৮৯৯-১৯৪২) ছিলো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উত্থান-পর্ব। আন্তর্জাতিক বিশ্বেও এসময় রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে।[১]

[১] এ সময়কার ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ হলো: সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (১৯০২-১৯৩০) স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), চীন বিপ্লব (১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯১৬-১৯২২), রুশ-বিপ্লব (১৯১৭), জালিয়ানওয়ালবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯), খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১২২), তুর্কী বিপ্লব (১৯২১), কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা দাবী (১৯২৯), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯, ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দানে অস্বীকৃতি (১৯২৯), মরক্কোর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রীফ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৯১৮-১৯৫৬), ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রভৃতি।

এসব ঘটনায় তিনি নানাভাবে আলোড়িত হন এবং স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পড়ে তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও রাজনৈতিক কর্মাদর্শে। তিনি সমাজ-প্রগতি বা জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে কিংবা স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগঠিত দেশ-বিদেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামের আলোকে ঐ সব আন্দোলন-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন, অথবা ঐসব আন্দোলন সংগ্রামের আলোকে স্বদেশের আন্দোলন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন।

পরাধীন ভারতবর্ষ তাঁকে বেদনাহত ও বিক্ষুব্ধ করেছে। তিনি ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর নির্যাতন-নিপীড়ন ও শাসন-শোষণ স্বচক্ষেই দেখেননি শুধু, প্রত্যক্ষ তার শিকারও হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী তাঁকে বিপ্লবী কবিতা [২] লেখার দায়ে এক বছর (১৯২৩) সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে, তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ [৩] বাজেয়াপ্ত করেছে, পাঁচটি গ্রন্থ[৪] বাজেয়াপ্তির সুপারিশ করেছে, এবং তাঁর পত্রিকা[৫] বা পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করেছে। এসব সত্ত্বেও তিনি হতাশ হননি, বরং জ্বলে উঠেছেন পূর্ণ তেজে। 'একজন সচেতন মানুষ হিসেবে তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন পরাধীনতার বেদনা। আর পরাধীনতা তাঁকে নুইয়ে দেয়নি, উদীপ্ত করেছিল [আতাউর রহমান ১৯৯৩:১৮]। তিনি দৃঢ় আশাবাদ পোষণ করতেন যে

অচিরেই ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। অবশ্য তিনি জানতেন, এমনিতে তারা যাবে না; তাদেরকে সংগ্রাম করে তাড়াতে হবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, বক্তৃতা বা ভাষণের মাধ্যমে তিনি তাই দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আহ্বান করেছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর কবিতা বা সঙ্গীত শুধুই স্বদেশ বা স্বাধীনতার আহ্বানধ্বনি নয়। বলা যায়: 'নজরুলের কবিতায় ও গানে আর সব কবির মতো প্রেম আছে, প্রকৃতি আছে, এমনকি আধ্যাত্মিক আকুলতাও আছে- তবে সব কিছুর উপরে আছে মানুষ - মানুষের সমাজ আর আছে স্বদেশ [আতাউর রহমান ১৯৯৩:৩৪]। তাঁর স্বদেশ স্বাধীন সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র-গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। তাঁর সমাজব্যবস্থা সর্বশোষণমুক্ত ও সর্বসংস্কারের ঊর্ধ্বে। *অগ্নিবীণা* (১৯২২), *বিষের বাঁশী* (১৯২৪), *ভাঙার গান* (১৯২৪), *সাম্যবাদী* (১৯২৫), *সর্বহারা* (১৯২৫), *ফণি-মনসা* (১৯২৭), *জিঞ্জির* (১৯২৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে উক্ত স্বদেশ ভাবনা নানাভাবে অভিব্যক্ত। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *সন্ধ্যা* (১৯২৯)-য় স্বদেশভাবনা ঘনীভূত রূপ লাভ করেছে। এ-কাব্যগ্রন্থে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন রাজনৈতিক পরাধীনতা, কুসংস্কার ও শাস্ত্রশাসন থেকে মুক্তি এবং যৌবনের জাগরণ।

তারুণ্য বা যৌবনই পারে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে। 'তিনি জানিতেন যে যুবকরাই কেবল বিপ্লব সাধন করিয়া তুলিতে পারে, বিদেশীর অধীনতা ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পার [মধুসূদন বসু ১৯৮৫:৭৮]। যুবকরাই পারে শাস্ত্র-শাসনের ঊর্ধ্বে উঠে সর্ব সংস্কারমুক্ত এক মানবতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। তাই তিনি স্বদেশভাবনা প্রসঙ্গে যৌবনের বন্দনা করেছেন, গেয়েছেন তারুণ্যের জয়গান। গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রেও এই ভাবনা-চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তিনি এটি উৎসর্গ করেছেন 'মাদারীপুর শান্তি সেনার কর শতদলে ও বীর সেনা নায়কের শ্রী চরণাম্বুজে'। তিনি এ-কাব্যগ্রন্থে দেশের পরাধীনতাকে তুলনা করেছেন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কাব্য গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন সন্ধ্যা। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালের ১২ই আগস্ট। সুতরাং এ কাব্যগ্রন্থ পাঠের সময় সমসাময়িক ভারতবর্ষের সংগ্রাম মুখর রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্মর্তব্য। উক্ত রাজনৈতিক আবহেই কাব্যগ্রন্থটি বিরচিত হয়েছে। 'কালের প্রভাব এড়িয়ে কোন মহৎ প্রতিভাই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। আনন্দের কথা যে, নজরুল সাহিত্যে কালের স্পর্শ সুগোচর, অথচ শিল্পগুণে তা কালোত্তীর্ণ' [আবদুল কাদির ১৯৮৬:৭৯]। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের সন্ধ্যা, তরুণ তাপস, আমি গাই তারি গান, কাল-বৈশাখী, তরুণের গান, চল্ চল্ চল্, রীফ-সর্দার, বাংলার "আজিজ", নিশীথ-অন্ধকারে, শরৎচন্দ্র, অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, তর্পণ প্রভৃতি কবিতায় কবির স্বদেশভাবনা প্রমুদ্রিত।

কবির স্বদেশ ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পূর্ব-পুরুষের ভীরুতা, অযোগ্যতা ও কাপুরুষতায় স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭), বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪), মহীশূরের যুদ্ধ (১৭৯৯), সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭) ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে (১৯০২-১৯৩০) অনেক দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার জন্যে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। স্বাধীনতার জন্যে জনগণ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছে, অনেক প্রাণ আত্মদান করেছে, অনেক প্রায়শ্চিত্ত করেছে পূর্ব-পুরুষের ভুল-ভীরুতার। তবু উঠছে না পূর্ব-দিগন্তে স্বাধীনতার সূর্য। গ্রন্থের কেন্দ্রীয় কবিতা সন্ধ্যায় কবি জিজ্ঞাসামুখর :

লক্ষ্মী। ওগো মা ভারত লক্ষ্মী। বল্, কত দিনে, বল্ —
খুলিবে প্রাচীর রুদ্ধ দুয়ার মন্দির অর্গল ?
[সন্ধ্যা, *সন্ধ্যা*]

এই কবিতায় কবি পরাধীনতাকে সন্ধ্যার সঙ্গে উপমিত করেছেন। জাতীয় জীবন থেকে এই সন্ধ্যা কখনো কাটবে কিনা ভাবছেন :

সন্ধ্যা কি কাটিবে না ?
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা ?
[সন্ধ্যা, *সন্ধ্যা*]

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর শাসন-পীড়ন একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তাই ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে তিনি অসুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দুর্গাকে আহ্বান করেছেন চণ্ডীবেশে নেমে আসার জন্যে। দুর্গারূপ শক্তির আবির্ভাবে হয় ব্রিটিশরা বিতাড়িত হবে, নয় তো স্বাধীনতাকামী মানুষ বীরের ন্যায় গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণ করবে। তাই দুর্গার[৮] কাছে তাঁর আকুল প্রার্থনা :

অসুরের হাতে লাঞ্ছনা আর হবনিসূদন শঙ্করী,
মরিতেই যদি হয় মা, দে বর, দেবতার হাতে মরি।
[সন্ধ্যা, *সন্ধ্যা*]

ভারতের পরাধীনতাকে তিনি নিশীথ অন্ধকারের সাথে তুলনা করেছেন। 'নিশীথ অন্ধকারে' গীতিকবিতায় পরাধীন ভারতের চিত্র এভাবে অঙ্কিত হয়েছে ঃ

ঘনঘোর অন্ধকারে সিন্ধু পারে বেদনার ঢেউ উঠেছে, চন্দ্র-সূর্য অস্তমিত হয়েছে, বইছে প্রবল বেগে পূবালী বাতাস। এমনি পরিস্থিতিতে বন্দিনী স্বদেশমাতা স্বাধীনতা লাভের জন্যে বার বার চেষ্টা করছে। কিন্তু সফল হচ্ছে না -

বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে কাঁদিতেছে কারাগারে,
শিয়রের দীপ যত সে জ্বালায় নিভে যায় বারে বারে।
[নিশীথ অন্ধকারে। *সন্ধ্যা*]

আবার 'অন্ধস্বদেশ-দেবতা' কবিতায় তিনি পরাধীনতার তমিস্রাচ্ছন্ন স্বদেশকে এভাবে চিহ্নিত করেছেন :

নিরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি
কুহেলি অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি।
[স্বদেশ-দেবতা', *সন্ধ্যা*]

এই অন্ধকার দূর করার বা পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে ফাঁসির রশ্মি ধরে স্বদেশ দেবতা আসছেন। তার চলার পথে পর্বত প্রমাণ বাধা -প্রাকৃতিক ও মানবিক প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু সকল প্রকার বাধা-বিপদ ও বিপর্যয় উত্তরণে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাধাবিঘ্ন যেন তাঁকে নব বলে বলিয়ান করে :

যত ঘিরে আসে পথে সঙ্কট চলে তত নব বলে।
[অন্ধস্বদেশ-দেবতা, *সন্ধ্যা*]

অন্ধ স্বদেশ দেবতা একা নন। তাঁর পেছনে রয়েছে শত শত নবীন যারা দেশ প্রেমে উদ্বোধিত, মৃত্যু-ভয়হীন এবং মৃত্যু পথযাত্রী। তিনি ক্লান্ত হয়ে পথে ঢলে পড়লে ঐ নবীন মৃত্যু পথযাত্রীরা এসে তাকে তুলে ধরবে এবং প্রয়োজনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে। তার পথ স্বাধীনতার। সেই পথ শ্বাপদ সঙ্কুল, রক্তাক্ত, পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক। সেই পথের এক প্রতিকী বর্ণনা দিয়েছেন কবি :

অন্ধকারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দী জাগে,
যথায় বধ্য মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,

যথায় পিষ্ট হতেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে
যথায় বন্য শ্বাপদের সাথে নখর দন্ত লয়ে,
জাগে বিনিদ্র বন্য তরুণ ক্ষুধার তাড়না সয়ে,
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁদে,
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে।
[অন্ধস্বদেশ-দেবতা, *সন্ধ্যা*]

এই অন্ধ দেবতা জনগণকে আহ্বান করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে-রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথেই আসবে দেশের স্বাধীনতা, অবসিত হবে কালোরাত :

ওরে ওঠ ত্বরা করি',
তোদের রক্তে রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী।
[অন্ধস্বদেশ-দেবতা, *সন্ধ্যা*]

তার ডাকে সবাই জেগেছে এবং সংগ্রামে অবতীর্ণও হয়েছে। এ সংগ্রামের পরিণতি হবে 'নবীন উষার হাসি'। এখানে কবির আশাবাদী চেতনা প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট। লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন না হলেও অন্ধ দেবতার ডাকে জনগণ সাড়া দিয়েছে। কারণ, তারা আহ্বানকে সত্য বলে জেনেছে। বস্তুত:

> মৃত্যুর গর্জন দেশপ্রেমিকদের কাছে সঙ্গীতের মত মনে হয়। তমসাবৃত রাত্রির ঘন অন্ধকারে নিরুদ্দেশের যাত্রী ছুটে চলে। সে জানে না কোথায় কোন্ পথে দেবতার আনন্দধ্বনি শ্রুত হয়। সে শুধু আহ্বানই শুনে। দেশ প্রেমিকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করা [ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯২:২৫১]।

অন্ধ স্বদেশ-দেবতা ও তাঁর অনুসারীদের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে কবি অভিনবত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এজিদ সেনার অবরোধে কারবালায় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ঠিক একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে। ভারতের পরাধীন পরিস্থিতিকে কারবালার সঙ্গে এবং ভারতের সংগ্রামী মানুষকে আব্বাসের সঙ্গে তুলনা করে ভারতবর্ষের মর্মন্তুদ পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন তিনি :

নব জীবনের ফোরাত কূলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর,
এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণপণ করি।
[তরুণের গান, *সন্ধ্যা*]

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠির স্বৈরাচারী চরিত্রের স্বরূপ সুস্পষ্ট করার জন্যে কবি তাদেরকে ফেরাউন ও নমরুদের সাথে তুলনা করেছেন। ইসলাম ধর্মের কাহিনীতে ফেরাউন ও নমরুদ ছিলেন চরম স্বৈরাচারী শাসক। তাঁরা নিজেদেরকে সার্বভৌম মনে করতেন। প্রতিপক্ষকে তাঁরা কঠোর হস্তে দমন করার প্রয়াস পেতেন। কিন্তু এক অলৌকিক শক্তিবলে ফেরাউনের হাত থেকে মুসা ও নমরুদের হাত থেকে ইব্রাহিম রক্ষা পান। ফেরাউন ও নমরুদ অপশক্তির প্রতীক। আর মুসা ও ইব্রাহিম শুভশক্তির প্রতীক। শুভশক্তির জয় অনিবার্য। তাই মুসা ও ইব্রাহিমকে ধ্বংস করা যায়নি। এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করে কবি স্পষ্টস্বরে বলেছেন- নব্য ফেরাউন বা নব্য নমরুদ ব্রিটিশরাও মারতে পারবে না মুসা বা ইব্রাহিমের মতো সত্যপন্থী আনন্দদূত তরুণকে। 'ভয়ের ভূতের এই দেশে' তরুণরাই আশাভরসার কেন্দ্রস্থল। তারা জরা-জীর্ণতা, অন্ধকার ও ভয়-ভীতি দূর করে দেশে যৌবনের জোয়ার আনবে। মশাল জেলে আলোকিত করবে নিশীথ শর্বরী। অর্থাৎ পরাধীনতার অন্ধকার দূর করে তরুণরা স্বাধীনতার আলো প্রজ্জ্বলিত করবে। স্বাধীনতার পথ বড় কন্টকাকীর্ণ, বড় বন্ধুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তরুণরা সে পথে জীবন উৎসর্গ করে যাবে যাতে নতুন যাত্রীরা অর্থাৎ আগামী প্রজন্ম সহজে পথ চলতে পারে- অনায়াসে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে। তাদের সুখ-শান্তি দেখে আত্মত্যাগকারীদের আত্মা একদিন শান্তি পাবে-:

নতুন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হতে।
ভবিষ্যতে স্বাধীন পতাকা উড়িবে যে-দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের স্মরি'।
[তরুণের গান : *সন্ধ্যা*]

'তরুণের গান' গীতিকবিতায় কবি তরুণদের 'ঝড়ের বন্ধু' বলে অভিহিত করেছেন। সেখানে 'ঝড়' বলতে তিনি বিপ্লবকে নির্দেশ করেছেন। ঠিক তেমনি

'কাল-বৈশাখী' কবিতায়ও কাল-বৈশাখী বিপ্লবের প্রতীকার্থ। এখানে তিনি সমাজ -রাষ্ট্রে কাল-বৈশাখী ঝড় তথা বিপ্লব কামনা করেছেন। বিপ্লব এলে ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা ভেঙে যেতো, দেশ নতুন করে গড়ে উঠতো, শ্মশানেও শোনা যেতো জীবনের স্পন্দন :

কাল-বৈশাখী আসিলে হেথায় ভাঙিয়া পড়িত কোন্ সকাল
ঘুণ-ধরা বাঁশে ঠেকা দেওয়া ঐ সনাতন দাওয়া, ভগ্ন চাল।
এলে হেথা কাল বৈশাখী
মরা গাঙে যেত বান ডাকি',
বদ্ধ জাঙাল যাইত ভাঙিয়া, দুলিত এদেশ টাল্‌মাটাল
শ্মশানের বুকে নাচিত তাথৈ জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল।
[কালবৈশাখী, *সন্ধ্যা*]

বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং গড়ে উঠে আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র- ব্যবস্থা। নজরুলের সমকালে সঙ্ঘটিত রুশ বিপ্লব, চীনে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা, তুরস্কে নতুন শাসন। আফগানিস্তানে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ প্রভৃতির কথা সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। নজরুল ছিলেন ঐ সব বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক। ফলে সেগুলো তাঁর সাহিত্যে ও সঙ্গীতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে। তাঁর স্বদেশেও এরকম বিপ্লব সৃষ্টি হোক, এটা ছিলো তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেখনীর মাধ্যমে তিনি সেই আকাঙ্ক্ষা। জনচিত্তে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন।

তরুণরা বিপ্লবের অমিত সাহসী সেনা। যুগে যুগে দেশে দেশে তরুণরাই বিপ্লব সাধন করেছে। সে কারণে নজরুল 'চল্ চল্ চল্' গীতিকবিতায় তরুণদেরকে 'অরুণ প্রাতের তরুণ দল' বলে অভিহিত করেছেন। নতুন দিনের নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে তরুণরা মার্চের তালে তালে এগিয়ে যাবে। তারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আনবে স্বাধীনতার রাঙাপ্রভাত :

ঊষার দুয়ার হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
[চল্ চল্ চল্, *সন্ধ্যা*]

পারস্য, রোম, গ্রীস বা রুশে তরুণ বিপ্লবীরা বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি ভারতের 'বেঁহুস' ও 'হীনবল' তরুণদিগকে জেগে উঠার আহ্বান ধ্বনিত করেছেন। অতীতের মায়া-মোহ ও স্বাধীনতা হারানোর বেদনা ভুলে তাদেরকে নতুন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তাদের লক্ষ্য ও অঙ্গীকার হবে সমৃদ্ধ স্বদেশ প্রতিষ্ঠা :

আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল।
[চল্ চল্ চল্, *সন্ধ্যা*]

অতীতের মোহ থেকে মুখ ফিরিয়ে বর্তমান বাস্তবের মোকাবেলা করতে পারলে ভবিষ্যতের স্বর্গ রচনা সম্ভব হবে। অতীতের গর্ভে রত্ন খোঁজা বৃথা। এক যুগের আদর্শ অন্য যুগে হুবহু চলে না, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে নিতে হয়. অথবা কখনো কখনো নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে হয়। পুরনো সংস্কার বর্জন করে নতুন আদর্শ গ্রহণে তরুণরাই অগ্রণী সেনানী। জরা-জীর্ণ শাস্ত্রের বন্ধন খুলে তরুণরা বেরিয়ে পড়বে আধুনিকতার উন্মুক্ত সড়কে। এটাই কবির প্রত্যাশা এবং ইতোমধ্যে যারা শাস্ত্র, নীতি, শাসন, সংস্কার ও ধর্মের বিধিনিষেধের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে এসেছে তাদের বন্দনাগীতি গেয়েছেন তিনি। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট কবি শুধু স্বাধীনতাই চাননি, তিনি একই সঙ্গে চেয়েছেন সর্বসংস্কার মুক্ত আধুনিক রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র বিশ্বের অন্যান্য আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে সমতালে এগিয়ে যাবে।

তাঁর সমকালে ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলো। বাঙালী মুসলমানের এক বড় অংশ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। যারা কিছুটা শিক্ষা লাভ করেছে, তারাও নানা কারণে সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। মুসলমান সমাজ ছিলো মোল্লা-শাসিত। ফলে সব কিছু ধর্মের নিরিখে বিচার করে দেখা হতো। নতুন কিছু গ্রহণে অনীহা ও বিরোধিতাই ছিলো এ-সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজেও ছিলো নানা কুসংস্কার। এ-সকল কুসংস্কার সমাজ-প্রগতির অন্তরায়। কুসংস্কার বা অন্তঃসার-শূন্য সনাতন মূল্যবোধ ছিলো তাঁর কাছে গ্রহণ-অযোগ্য। মুসলমান সমাজের অন্ধকার দূর করতে শিক্ষার আলোক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন আবদুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬)। আর হিন্দু সমাজে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। আজিজ মুখ্যত সমাজকর্মী, গৌণতঃ সাহিত্যিক। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র মুখ্যত সাহিত্যিক, গৌণত সমাজকর্মী। তাঁদেরকে কেন্দ্র করে রচিত কবিতা

দু'টিতে (শরৎচন্দ্র ও বাংলার "আজিঙ") কবির আকাঙ্ক্ষিত সমাজ বা স্বদেশ-চেতনা স্পষ্টরূপ লাভ করেছে।

শরৎচন্দ্র তৎকালীন কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর বায়ান্নতম জন্মবার্ষিকী (১৯২৮) উপলক্ষে 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাটি রচিত হয়। তাতে নজরুল তাঁকে 'নব ঋত্বিক নব যুগের', 'রাতের উদীচি ঊষা', 'নরলোকের নারায়ণ' ও 'মানুষের কবি' বলে অভিহিত করেছেন। শরৎচন্দ্র মাটির মানুষের কাছাকাছি থেকে মাটির মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। সামাজিক কুসংস্কার ও বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে নির্যাতিত নর-নারীর দুঃখ-বেদনার সকরুণ ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তিনি। ফলে শাস্ত্রপন্থী আভিজাত্যগর্বীরা তাঁর নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন:

> খান কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই লাগেনি,-পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙলা ভাষার আমি একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছি [শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৩:১৫৯]

কিন্তু এতে শরৎচন্দ্র বিচলিত হননি। তিনি আপন বিশ্বাসে ও আদর্শে অটল থেকে মিথ্যা, কুসংস্কার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনী অব্যাহত রেখেছেন। ফলে দেশে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

মৃত সাগরের এই সে দেশ
পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই।
[শরৎচন্দ্র, *সঞ্চয়*]

সাহিত্য, সঙ্গীত বা রাজনীতির মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণই ছিল নজরুলের পরম প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার অভিব্যক্তি তিনি লক্ষ করেছেন শরৎ-সাহিত্যে। তাই তিনি তাঁর প্রশংসিত পুরুষ।

আবদুল আজিজ ছিলেন নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথম দিকের উচ্চ শিক্ষিতদের অন্যতম। ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় তিনি সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮১) গঠন করেন যা কিনা তৎকালে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি, ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল, কবিরুদ্দীন মেমোরিয়াল হল, ইসলামিয়া রিডিং রুম প্রভৃতি তাঁর অমর কীর্তি। এছাড়া মুসলমান ছাত্রদের

শিক্ষার জন্যে তিনি দু'লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে যান। আবদুল আজিজের শিক্ষা প্রসারের আন্তরিক প্রয়াস, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে নজরুল সম্যক অবগত ছিলেন এবং সে কারণে তাঁকে উপলক্ষ করে লিখেছেন 'বাংলার "আজিজ" শীর্ষক কবিতা। বাঙালী মুসলমানরা অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের অতল আঁধারে নিমজ্জিত ছিলো। সেই অন্ধকারে আবদুল আজিজ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে 'মশালবাহী বিশাল পুরুষ'। মুয়াজ্জিনের মতো সবার আগে তিনি বাঙালী মুসলমানের বাস্তব চিত্র ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজিজের ভূমিকা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান।
[বাংলার আজিজ, *সন্ধ্যা*]

তার ফলে :

আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবল দল
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাঙলা টলমল।

আবদুল আজীজের ঐকান্তিক উৎসাহে তাঁর দৌহিত্র হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬) ও দৌহিত্রী শামসুন নাহার (১৯০৮-৬৪) নবজাগ্রত বাঙালী-মুসলমানের প্রতিনিধি রূপে আর্বিভূত হন ; শিক্ষা, সাহিত্য-সাধনা ও সংস্কৃতি-চর্চায়, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বাহার-নাহার পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। কবি প্রসঙ্গ-সূত্রে সে কথাটিও স্মরণ করেছেন। শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও আবদুল আজীজের চারিত্রিক গুণাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশকে আলোকিত করেছে। তিনি ছিলেন পর্দা-প্রথার বিরোধী ও হিন্দু-মুসলমান মিলনপন্থী। এদিক বিবেচনায় কবি তাঁকে 'দুশমন পর্দার' ও 'সাম্যবাদী' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুকে বাঙালী মুসলমান সমাজই শুধু নয়, সমগ্র বাঙালী সমাজেরই আলো নিভে গেলো। তাই 'অন্ধকারে হাতড়ে মরে অন্ধ এ সমাজ'। এসমাজকে আবার আলোকিত করার জন্যে নিশান-বরদার বীর আজিজের আগমন প্রয়োজন। তাই কবির প্রার্থনা :

আবার এসো সবার মাঝে শক্তি রূপে বীর,
হিন্দু সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর।
[বাংলার আজিজ, *সন্ধ্যা*]

চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রচিত হয়েছে 'তর্পণ' শীর্ষক কবিতাটি। ১৯১৭ সাল থেকে আমৃত্যু চিত্তরঞ্জন রাজনীতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সালে তিনি সর্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং কারা ভোগ করেন। এছাড়া মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্যাক্ট (১৯১৮), রাউলাট এ্যাক্ট (১৯১৯), পাঞ্জাবে চণ্ডনীতি (১৯১৯) ও জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার (১৯১৯) বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি কংগ্রেসের ভেতর অধিকতর বিপ্লবী দল- 'স্বরাজ্য দল' (১৯২২) গঠন করেন। এ দল ১৯২৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাঁর উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতুবন্ধ 'ন্যাশনাল বেঙ্গল প্যাক্ট'[৯] (১৯২৩) স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য উগ্র হিন্দুরা ঐ-চুক্তির বিরোধী ছিলো। এই স্বাধীনতাকামী, বিপ্লবী রাজনীতিক ও মানবতাবাদী নেতার মৃত্যুতে নজরুল শোকাভিভূত হয়ে পড়েন এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় রচনা করেন চিত্তনামা (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থ। সেখানে তাঁর মৃত্যুতে কবির মনে হয়েছে সারা দেশে 'অকাল সন্ধ্যা' নেমে এসেছে ও 'ইন্দ্র পতন' হয়েছে। 'তর্পণ' কবিতাটিতেও ঐ কাব্যগ্রন্থের ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে এবং সঙ্গতকারণেই এখানেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ঘনীভূত দেশপ্রেম বা দেশভাবনা।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর হিন্দু মুসলমানের মিলনের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে (১৯২৬) উগ্র হিন্দুদের চাপের মুখে ন্যাশনাল বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পারিক সন্দেহ ও সংঘাত বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতি ভারতে দুরবস্থার সৃষ্টি করে:

আজিও তেমনি করি
আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়ে এসেছে
ভারত ভাগ্য ভরি'
আকাশ ভাঙিয়া তেমনি বাদল
ঝরে সারা দিন মনভ
[তর্পণ, *সন্ধ্যা*]

ভারতের চারদিকে দুর্যোগের ঘনঘটা। অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িকতা, নেতৃত্ব-শূন্যতা ও ভীরুতা প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে নতুন করে। সবাই ভুলে গেছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম, মানবতা, বীরত্ব ও জাতীয় ঐক্য-চেতনা। ফলে ভারতবাসী পরিণত হয়েছে 'হত ভাগ্যের জাতি'তে এবং ভারত পরিণত হয়েছে 'ভীরু ভারত ভূমি'তে। কবি বলতে চান এই ভীরু বা কাপুরুষ জাতির কোনো নৈতিক অধিকার নেই দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করার :

তোমারে তুষিব আমরা ত নহি
শ্রাদ্ধের অধিকারী।
[তর্পণ, *সন্ধ্যা*]

যাঁরা সাহসী, সংগ্রামী, স্বাধীনচেতা এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আত্ম নিবেদিতচিত্ত তাঁরাই করবে তাঁর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান :

শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে
বীর অনাগত তারা
স্বাধীন দেশের প্রভাত সূর্যে
বন্দিবে তোমা যারা।
[তর্পণ, *সন্ধ্যা*]

তাহলেই তাঁর আত্ম শান্তি পাবে, তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হবে এবং সর্বোপরি তাতেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হবে সুন্দর, শোভন ও তাৎপর্যবহ। কেননা তাঁর স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠা এবং সেই স্বদেশে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা। কবি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন যাতে ভারতবাসীরা দেশপ্রেমে, বীরত্বে, নেতৃত্বে, জাতীয়তাবোধে ও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমেও কবি স্বদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ প্রচেষ্টাকে কবির আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বলেও চিহ্নিত করা যায়। 'রীফ সর্দার' কবিতায় তিনি আবদুল করিমের (১৮৮২-১৯৬৩) বীরত্ব, সাহস, মানবতাবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়েছেন এবং পাশাপাশি উন্মোচন করেছেন ইউরোপের দস্যুবৃত্তি ও অমানবিকতা। এখানে উল্লেখ্য, আবদুল করিম ছিলেন মরক্কোর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময় মরক্কোর এক বৃহৎ অংশ ফ্রান্সের ও এক ক্ষুদ্র অংশ স্পেনের অধিকার থাকে। যুদ্ধের শেষের দিকে মরক্কোর বিভিন্ন উপজাতি এ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। করিম ও তাঁর পিতা এসব উপজাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে নেতৃত্ব দেন। তাঁর পিতা এক যুদ্ধে স্পেনীয় বাহিনীর হাতে নিহত হন। এদিকে করিম বন্দী হয়ে (১৯২৬) এগার মাস কারাবরণ করেন। পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে স্পেনীয় বাহিনীকে পরাস্ত করেন। অতঃপর তিনি মরক্কোর সুলতান হন এবং রীফ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। পরে ফরাসী ও স্পেনের যৌথ আক্রমণে ও কিছু স্বদেশীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এর পর তাঁকে রি-ইউনিয়ন দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয় (১৯২৬)। এসব ঘটনা অবলম্বনে 'রীফ সর্দার' কবিতাটি বিরচিত। এখানে কবির দৃষ্টিতে আবদুল করিম 'নেপোলিয়ন', ' যুগাবতার', 'মরুকেশরী', 'শাহান শাহ' ও 'বীর' প্রভৃতি এবং ইউরোপ 'এজিদ'। এই ইউরোপ-এজিদ ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিপক্ষ তথা স্বাধীনতাকামী মরক্কো জাতিকে ধ্বংস করত চায়। এসব করেও তারা নিজেদেরকে বীরের জাত ও সভ্য বলে গণ্য করে। অথচ তথাকথিত সভ্যতা-গর্বী এই ইউরোপীয়রা মরক্কোর নারী-পুরুষ-শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এমনকি যুদ্ধ বন্দীদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ। মরক্কোর উপর সাম্রাজ্যবাদী স্পেন ও ফরাসীর আগ্রাসন ও নির্যাতনের ফিরিস্তি বর্ণনায় কবির স্বদেশের দুর্ভাগ্য ছায়া ফেলেছে পরোক্ষভাবে [রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ : ২৫৭] স্বদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মর্মরিত কবি বিশ্বের অন্যত্রও স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। স্বদেশের জন্যে তাঁর যা আকাঙ্ক্ষা বিশ্ববাসীর জন্যেও সেই একই আকাঙ্ক্ষা, কবি-মানসের আন্তর্জাতিক চেতনাবোধের কারণেই এ রকম আকঙ্ক্ষা সম্ভব হয়েছে। অন্যত্র তিনি নিজেই বলেছেন-'এক বেদনার কমরেড ভাই মোরা সবাই [নজরুল ইসলাম ১৯৯৩ক:৪৫২]

রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে জাতির জীবনে কোনো প্রকার আর্থিক-আত্মিক বা মানসিক বিকাশ ঘটে না। ফলে চিন্তাচেতনা বা সাংস্কৃতিক দিক থেকেও পরাধীন জাতি বহু পাশ্চাতে পড়ে থাকে। ঐ পশ্চাৎপদ জাতির জীবনে সৃষ্টি হয় নানা কুসংস্কার, ভীরুতা, জরা-জীর্ণতা ও সংকীর্ণতা। এসব আবার নির্যৌবনের লক্ষণ। *সন্ধ্যা* কাব্যে দেশের পরাধীনতা যেমন সন্ধ্যার প্রতীক ঠিক তেমনি নির্যৌবনও সন্ধ্যার প্রতীক। এই সন্ধ্যার অবসান ঘটানোর জন্যেই তিনি এ কাব্যে যৌবনশক্তির উদ্বোধন কামনা করেছেন।

সন্ধ্যা কাব্যে কাজী নজরুল ইসলাম দেশচেতনা গাঢ় বর্ণে অঙ্কিত করেছেন। অবশ্য তাঁর কাছে দেশ কোনো ভৌগালিক রূপ- প্রকৃতি নয়, বরং তাঁর কাছে দেশ

মানুষেরই অন্য নাম। *সন্ধ্যা* কাব্যের প্রাক্কালে রচিত *কুহেলিকা* (১৯২৭) উপন্যাসে তাঁর দেশচেতনা এভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে :

> আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয়রে অনিম। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই। তবু আমি শুধু ভারতের জলবায়ু-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভালবাসিনি। আমার ভারতবর্ষ ভারতের এই মূক-দরিদ্র নিরন্ন-পর পদদলিত তেইশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে গড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের মহামানুষের মহাভারত [নজরুল ইসলাম ১৯৯৩খ :৬৫২]

এই মহামানুষের মহাভারত অর্থাৎ একটি মানবতান্ত্রিক স্বদেশ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর জীবনাকাঙ্ক্ষা। এই জীবনাকাঙ্ক্ষার আবেগঘন শৈল্পিক প্রকাশ *সন্ধ্যা* কাব্যগ্রন্থ।

টীকা

২　আনন্দময়ীর আগমনে (*ধূমকেতু*, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২)

৩　*যুগবাণী* (১৯২২), *বিষের বাঁশী* (১৯২৪), *ভাঙার গান* (১৯২৪), *প্রলয়-শিখা* (১৯৩০), *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)।

৪　*অগ্নিবীণা* (১৯২২), *সর্বহারা* (১৯২৬), *রুদ্র মঙ্গল* (১৯২৭), *ফণি-মনসা* (১৯২৭), *সঞ্চিতা* (১৯২৮)

৫　*নবযুগ* (১৯২০) ও *ধূমকেতু* (১৯২২)।

৬　উল্লেখ্য যে, দুর্গা হচ্ছেন শক্তি ও মুক্তির প্রতীক। এ দুর্গা স্বর্গকে অসুর মুক্ত করেন।

৭　'ভূতের ভয়' নাটিকায়ও কবির অনুরূপ বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে তিনি বিপ্লব কুমারের জবানীতে বলেছেন, 'আমরা আত্মদান করে ভয় মুক্ত করে গেলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিলাম দেব-লোকের যুব শক্তির বাহুতে। এর পরে যারা আসবে এই পথে তারাই আমাদের শবের কঙ্কাল ধরে আমাদের আহতদের রক্ত চিহ্ন অনুসরণ করে যাবে আমাদের উদ্ধার সাধনে।

৮　১৯১১-১২ সালে হাবড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯১৩ সালের ১৪ই জুলাই তিনি ঐ পদ থেকে সরে যান। অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২০-২২) সক্রিয় সমর্থক।

৯. এ চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ৬০% ও সংখ্যালঘিষ্ঠ ৪০% আসন পাবে সরকারী দপ্তরে মুসলমানদের ৫০% চাকুরী সংরক্ষিত থাকবে - অবশ্য ঐ পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত মুসলমানরা ৮০% চাকুরী পেতে থাকবে। কোন ধর্মীয় আইন পাশ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের আইন সভার সদস্যদের ৩/৪ অংশের সমর্থন দরকার হবে; কোনো মসজিদের পাশে গান-বাজনা করা যাবে না, এবং গো-জবাই ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না [মুহম্মদ আবদুর রহিম ১৯৭৬: ২২৬]

১০. চিত্তরঞ্জন ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও জন দরদী রাজনৈতিক নেতা। দেশ ও জাতির জন্যে তিনি ছিলেন আত্মোৎসর্গীকৃতচিত্ত। তিনি যেন ছিলেন হিন্দুর আকবর ও মুসলিমের আরঙ্গজিব স্বরূপ।[১০] অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পরিণামে সৃষ্টি হয় ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং তা অব্যাহত থাকে পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছর। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ছোট-খাট হাঙ্গামা বাদ দিলেও একশ' বারোটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯২৭ সালেই সংঘটিত হয় একুশটি দাঙ্গা।

গ্রন্থপঞ্জি

আতাউর রহমান — *নজরুল: ঔপনবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি।* ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট ১৯৯৩

আবদুল কাদির — *যুগকবি নজরুল।* ঢাকা: বাংলা একাডেমী। ১৯৮৬

আবদুর রহিম — *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস।* ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম
১৯৯৩ক — *নজরুল রচনাবলী,* ১ম খণ্ড;
১৯৯৩খ — *নজরুল রচনাবলী,* ২য় খণ্ড;
১৯৯৩গ — *নজরুল রচনাবলী,* ৪র্থ খণ্ড;
ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় — *নজরুল ইসলাম: কবিমানস ও কবিতা।* কলকাতা : রত্নাবলী। ১৯৯২

মধুসূদন বসু　　*নজরুল কাব্য পরিচয়।*
১৯৮৫　　পুস্তকবিপণী।

রফিকুল ইসলাম　　*কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য।*
১৯৯১　　কলকাতা:কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী।

রমেশচন্দ্র মজুমদার　　*বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।*
১৯৭৫　　কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়　　*সাহিত্য ও সমাজ।* কলকাতা: জিজ্ঞাসা।
১৯৭৩